নজরুলের কাজের কেন্দ্রবিন্দু

নজরুলের কাজের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে একটি সাম্রাজ্যিক শক্তির সঙ্গে জাতি/এথনিসিটির সম্পর্ক; আবার জাতি, এথনিসিটি, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যকার সম্পর্ক: এসব কিছু নজরুল ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে পরিক্রমণ করেছেন অন্যতা, প্রান্তিকতা, নির্যাতনময়তার ডিসকোর্সের মধ্যে দিয়ে। ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের মধ্যে দিয়ে তিনি পরিক্রমণ করেছেন জাতিক ভিন্নতার মধ্যে দিয়ে, এই ভিন্নতার একদিকে আছে অন্যতার সাংস্কৃতিক নির্মাণ (হিন্দু মুসলমান অন্যতা বনাম ইংরেজ এবং হিন্দু অন্যতা বনাম মুসলমান অন্যতা) এবং অপরদিকে আছে বাংলা কিংবা ভারতের ঔপনিবেসিক অবস্থান বনাম সাম্রাজ্যিক ইংরেজ শাসন।

নজরুল বিরোধিতা করেছেন সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, অন্ধ জাতীয়তাবাদ, পুরুষের আগ্রাসন এবং সাম্রাজ্যবাদ; তিনি পরিক্রমণ করেছেন নারী চেতনার স্বরূপ, একই সঙ্গে তিনি নিজের দেশে নির্বাসিতর জীবন যাপন করেছেন। নজরুল তাঁর কাজে কণ্ঠ দিয়েছেন তাদের যাদেরকে নিস্তব্ধ করে রাখা হয় প্রচল সংস্কৃতির প্রান্তে, তিনি সর্বজনীন করেছেন ইংল্যান্ডের সঙ্গে স্বাধিকারহীন ও স্বাধীনতাহীন বাংলা/ভারতের সম্পর্ক। এই অর্থে তার কাজ হচ্ছে বিকল্প অন্বেষণ, একটি প্রচল সংস্কৃতির হেজিমনিক নির্বাণের বিরুদ্ধে বিকল্প, এই বিকল্পের লক্ষ্য প্রচল ও ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের প্রান্তে অবস্থিত জোর করে নিস্তব্ধ করে দেয়া কণ্ঠগুলো খুঁজে বার করা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রাণপণ চেষ্টা করেছে আমরা/তারা বিভাজন স্থায়ী করতে। এই বিভাজন উত্থিত ভিন্নতার অর্থ ব্রিটিশ কর্তৃত্বের কেন্দ্র সভ্য, এই কর্তৃত্ব তার দরুন যুক্তিশীল; অন্যপক্ষে বঙ্গীয় ঔপনিবেশের অর্ন্তগত জনসমষ্টি আদিম, অ-সভ্য, অ-যুক্তিশীল; এই আদিমতা, অ-সভ্যতা, অ-যুক্তিশীলতা থেকে বঙ্গীয় জনসমষ্টির উদ্ধার নেই। ওই বদ্ধ ও অন্তঃসারমূলক স্মারকের অর্থ বন্যতা বনাম সভ্যতা বিভাজন, এই বিভাজনের লক্ষ্য সাম্রাজ্যিক ব্রিটিশ/ইউরোপিয়ান সত্তা সার্বভৌম এবং বঙ্গীয় ঔপনিবেশের অন্তর্গত জনসমষ্টির সত্তা অ-সার্বভৌম। দেশজ সংস্কৃতি বিদেশী ইতিহাস ও সভ্যতার উপস্থিতি মোকাবিলা করতে অক্ষম। তার দরুন ব্রিটিশ সত্তার সার্বভৌমত্ব হচ্ছে বাঙালি ভারতীয় সাংস্কৃতিক অবলুপ্তির প্রচল আখ্যান। ব্রিটিশ বাংলার অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবাদী আবহাওয়ায় বাঙালির পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যক্তিকতা নির্মাণের সুযোগ নেই।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তার দরুন একটি মর্মান্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ঃ অধস্তনের পক্ষে কি কথা বলা সম্ভব? সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে তার কোন স্পেস নেই কথা বলার। সেজন্য তার পক্ষে সবাই কথা বলে, (যেমন ঔপনিবেশিক শক্তি, শিক্ষিতদের রাজনৈতিক দল, ভদ্রলোক শিক্ষিত জন), কিন্তু সে নয়, সে নয়। যদি জাতিগত, বর্ণগত, কলোনাইজড অধস্তনদের কথা বলতেই হয়, নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতেই হয়, তাহলে, তারা কিভাবে নিজেদের কথা বলবে? নজরুল কিভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং এভাবে নির্বাণ/প্রতিনিধিত্ব করবেন অ-নির্বিত ও অ-প্রতিনিধিত্বশীল জনসমষ্টির বিবেক? তিনি কি অধস্তনদের পক্ষে কথা বলবেন, কিংবা নির্যাতকদের (ঔপনিবেশিক শক্তি/দেশজ বুর্জোয়া ভদ্রলোকদের শক্তি) ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ব্যবহার করবেন? নজরুলের ভাষা ব্যবহারের সমস্যা, মনে হয়, এ ক্ষেত্রে। (জসিম উদ্‌দীনের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।) নজরুল নেহায়তই ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঘটনা, আবেগকে একটি বিপরীততার মধ্যে, প্রভুত্ব ও অধস্তনতার ফ্রেমে বুঝবার চেষ্টা করেননি। তিনি প্রভুত্ব ও অধস্তনতার মধ্যে বহুতর অসঙ্গতি, প্রতিটি ধারণার মধ্যকার বৈপরীত্য জানতে চেয়েছেন। তার দরুন ভাষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রান্তিক শব্দ, উপমা ব্যবস্থার মধ্যে লোকজ রীতি, তুলনা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষিত রুচি বনাম নিরক্ষরদের ঐতিহ্য, হিন্দু ঐতিহ্যের বিপরীতে মুসলমান ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শুদ্ধ পরম্পরা দেখা যায়। নজরুলের ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর উত্তরাধিকারের ভিত্তি কঠোর বিপরীতবাদী ভিন্নতার ধারণা নয় (সাম্রাজ্যবাদ বনাম দেশজবাদ)। তাঁর ক্ষেত্রে ভিন্নতার ভিত্তি উৎসারিত অ-সমরূপতা থেকে, এই অ-সমরূপতা উৎসারিত বিভিন্ন সীমান্ত থেকে (হিন্দু ঐতিহ্য, মুসলিম ঐতিহ্য, নিরক্ষরদের ব্যবহৃত হিন্দু ঐতিহ্য, নিরক্ষরদের ব্যবহৃত মুসলিম ঐতিহ্য), প্রভাব ও মিথস্ক্রিয়ার জীবন্ত ভুবন থেকে। মৃত্যুক্ষুধা উজ্জ্বল উদাহরণ। এই পরিসর থেকে তৈরি হয় অবস্থান ও প্র্যাকটিসের বহুতরতা ও অন্তঃপ্রবিষ্টতা, বদলে যায় বদলে যেতে থাকে ডিসকার্সিভ অবস্থা, নজরুলের কবিতা তাই, একই কবিতা ক্রমাগত বদলে যায় বহুতর অবস্থানে, অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় বিভিন্ন উল্লেখ, শব্দের বিভিন্ন ঐতিহ্য; তৈরি হয় গতিশীল বর্ণনা, উল্লেখ ও আখ্যান ও উপমা। এই কারণেই নজরুলের পক্ষে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ মফস্বলীয়ানার বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদ।

নজরুলের এই অবস্থান এক হিসাবে প্রতিবাদ হিন্দু মহাসভার বিশুদ্ধ বাঙালি নির্মাণের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম লীগের বিশুদ্ধ মুসলিম নির্মাণের বিরুদ্ধে। নজরুল মেনে নিয়েছেন সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্করতা এবং ডিসকার্সিভ প্রভাব ও সাংস্কৃতিক গঠন মধ্যকার সহযোগিতা। তাঁর কাজ, ক্রমাগত হয়ে উঠেছে অনুভূতিশীল সঙ্করতার দোদুল্যমান স্বরূপ ও হেজিমনিক ও ডিসকার্সিভ গঠনের অন্তঃপ্রবিষ্টতা সম্বন্ধে। ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদ, হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধী ও অন্তঃসারভিত্তিক চূড়ান্ততার বিরুদ্ধে তিনি অ-সমরূপতা ও ভিন্নতার বিভিন্নতা তুলে ধরেছেন, তাঁর কাছে বাঙালী সংস্কৃতি সেজন্য অ-সমরূপতার বহুতরতা, যার মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন ভিন্নতা। তিনি সীমানা তোলেননি, সীমানা ভেঙ্গেছেন, তিনি শুদ্ধতার পক্ষ নেননি, অ-শুদ্ধতার পক্ষে লড়াই করেছেন, তিনি সমরূপতা চাননি, অ-সমরূপতার নানা দিক চেয়েছেন।

তিনি হেজিমনিক কর্তৃত্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঃ জাতীয়তা, ভাষা, ধর্মের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি হিন্দু জাতীয়তা নির্মিত বাঙালি জাতীয়তা কিংবা মুসলিম জাতীয়তা নির্মিত বাঙালি জাতীয়তার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত বাংলা ভাষার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এভাবে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজের জন্য বহুতরতা ও বিভিন্নতা, বাঙালিয়ানার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকতা।

নজরুলের কাজ হচ্ছে জাতি উত্থিত বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যিক রাজনীতির ওপর তাঁর নিজস্ব টেক্সট। তিনি কলোনাইজড ব্রিটিশ বাংলার সকল রং ও সকল মোড়ের জটিল রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে প্রোথিত ও নিমজ্জিত। নজরুলের কাজের সকল টেক্সচারের মধ্যে বোনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিক প্রতিরোধের নানা ডিসকোর্স। নজরুলের টেক্সটের মধ্যে মতাদর্শের অনুপুঙ্খ উপস্থিতি এক পক্ষে তাঁর অধস্তনদের জাতীয়তাবাদের পক্ষে প্রবল অনুরণন,

অন্যপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বাঙালি ভদ্রলোক জাতীয়তাবাদী চেতনার এক ধরনের অবদমনের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। তিনি যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মফস্বলী চেতনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তেমনই জাতীয়তাবাদের ব্রিটিশ নির্মিত সাম্রাজ্য, উপনিবেশ, জাতি প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। নজরুল প্রচল সংস্কৃতির পক্ষে কখনও ছিলেন না। অধস্তনদের সংস্কৃতি, নিরক্ষরদের সংস্কৃতির পক্ষে তাঁর অবস্থানের দরুন প্রচল সংস্কৃতির মুরব্বিরা তাঁর সাহিত্যকর্মকে অবজ্ঞা করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা সার্থক হয়নি, তার কারণ, সাধারণ মানুষ তাদের হৃদয়ে ও স্বপ্নে ও আকাঙ্ক্ষায় নজরুলের সাহিত্যকে অবিনশ্বর করেছে। সেজন্য প্রচল সংস্কৃতির অভিভাবকরা, ভয় পেয়েছেন এবং দূর থেকে সালাম করেছেন নজরুলকে বাধ্য হয়ে। যাঁরা তাঁকে সালাম করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মোহিতলাল এবং বুদ্ধদেব এবং জীবনানন্দ এবং মোতাহের হোসেন চৌধুরী। সাধারণ মানুষ যাঁকে সাহিত্যের যুবরাজ বলে ভেবেছে তাঁকে সাহিত্যের ভদ্রলোক অভিভাবকরা কতদূর পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? ভদ্রলোকদের, বার বার হটিয়ে এভাবে নজরুল সাহিত্যের কেন্দ্রে পৌঁছে যান।

নজরুলের স্বদেশচেতনা, দেশকালিক সাধনা

বাংলা সাহিত্যে এমন কবির উপস্থিতি বিরল, যাঁর চেতনায় এবং রচনায় মতাদর্শগত দিক থেকে কমবেশি বৈপরীত্যের বা স্ববিরোধিতার প্রকাশ নেই। নজরুলের কবিতা বা গানে বা অন্যান্য রচনায় স্বদেশচেতনা বা মতাদর্শ বৈপরীত্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করার মত। স্বদেশচেতনার ক্ষেত্রে এই আপাত-বৈপরীত্যের কারণ নজরুলীয় স্বভাবধর্মের অস্থিরতা– যে জন্য তিনি মতাদর্শের দিক থেকে নির্দিষ্ট স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। যে কোন পথে লক্ষ্য অর্জন ছিল তাঁর অভীষ্ট।

আহমদ রফিক

সে লক্ষ্য ছিল স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন, যে কোন মূল্যে যে কোন পথে স্বদেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করা। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে নজরুল এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি দেশের স্বাধীনতা তথা স্বাদেশিকতাকে সাহিত্যের শৈল্পিক মূল্যের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। সে ক্ষেত্রে আবেগ ছিল সর্বাধিক। সম্ভবত এ আবেগই নজরুলকে এক স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়নি– একপথ থেকে অন্যপথে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর নানাবিধ রচনার যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণে বিষয়টি ধরা পড়ে।

তাঁর আপাত-বৈপরীত্য ছিল লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার নানা মাত্রায় ধৃত। তাই যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক বা পরস্পর-বিপরীত (যেমন জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ ইত্যাদি) মতাদর্শে তাঁর স্থিতি তেমনি একই কারণে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কিংবা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈকট্য গড়ে তুলতে গিয়ে উভয়কে নিয়ে দুই ভিন্ন বা বিপরীত ধারায় ভক্তিবাদী গীতগান রচনা করেছেন নজরুল। আপাত বিচারে বিপরীত মনে হলেও নজরুলের দৃষ্টিতে তা বিপরীত চরিত্রের ছিল না। বরং এটাই ছিল নজরুলীয় বৈশিষ্ট্য।

লক্ষণীয় যে, বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ক্ষোভ, ক্রোধ এমন কি ঘৃণা বিভিন্ন উৎস থেকে তাঁর মানসে ইতিবাচক পুষ্টি আহরণ করেছিল। এখানে যতটা তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভবত তার চেয়ে বেশি বন্ধু কমরেড মুজফফর আহমদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য থেকে এবং বিপ্লববাদীদের সঙ্গে যোগসূত্র থেকে। সাম্যবাদের শ্রেণীচেতনার তুলনায় এমনকি জাতীয়তাবাদের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তুলনায়ও বিপ্লববাদের রক্তঝরা পথের দিকে নজরুলের আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। শেষোক্তের রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারিজম ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়।

হয়তো এ কারণেই তাঁর রচনায় উল্লিখিত উগ্র রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ সব চাইতে বেশী। এর প্রকাশ ঘটেছে যেমন তাঁর গুটিকয় উপন্যাসকল্প রচনায় তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক সার্থক বা সাদামাটা কবিতায় এবং গানে; সেই সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত আগুনঝরা নিবন্ধে কিংবা সম্পাদকীয় স্তম্ভে। এগুলোতে নজরুলের মূল রাজনৈতিক অন্বিষ্ট চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর স্বদেশচেতনায় রোমান্টিকতাই একমাত্র প্রধান উপকরণ ছিল না, বরং রাজনৈতিক বাস্তবতাও যে বিচার্য বিষয় ছিল সে প্রমাণ মেলে স্বদেশের দুই বিবদমান সম্প্রদায়কে এক ঠাঁই করে 'বিদেশী শাসক হঠাও'-এর মত কঠিন কাজে ব্যবহার করার চেষ্টার মধ্যে। রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এদের মেলানোর ব্রতই অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল বলে কাজটা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে আপাতমিলের চেয়ে শৈল্পিক মাধ্যমের সাহায্যে অন্তর্মিল গড়ে তুলতে পারাটাই হবে বড়ো কাজ। এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এবং লেখায়ও দেখা যায়। এ বিষয়ে তাঁর সাহিত্য কর্মে দুই বিপরীতকে কাছে টানার প্রচেষ্টায় অনেকে তাঁর রচিত সংশ্লিষ্ট গীতগানে স্ববিরোধিতা খুঁজে পেয়েছেন, সে ক্ষেত্রে নজরুলকে ভুল বুঝেছেন উভয় সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক মানুষ। নজরুল বাঙালী জাতীয়তার সঙ্করূপে বিশ্বাস রেখে তা বাস্তবে পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছিলেন, তাতে ভুল ছিল না। কিন্তু ছিল সময়ের তুলনায় কিছুটা অগ্রসর চিন্তার। তাই বিষয়টি সংস্কৃতির দিক থেকে কিছুটা সমর্থন পেলেও রাজনৈতিক দিক থেকে অর্থবহ কোন সমর্থন বা সহযোগিতা পায়নি নজরুলের চিন্তা ও চেষ্টা।

এদিক থেকে নজরুলের গীতগান এ সত্যই প্রমাণ করে। নজরুলের ভক্তিনিষিক্ত শ্যামাসঙ্গীতে (যেমন ' বল্ জবা বল্' কিংবা 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' ইত্যাদি) বা কীর্তনে যেমন সম্প্রদায় বিশেষের পুরললনাগণ আবেগে সিক্ত ও বিহ্বল হয়েছেন তেমনি এর ফলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে বিপরীত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বা সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মনে।

অন্যদিকে তিনি যখন একইভাবে গানে, কবিতায় আপন সম্প্রদায়ের মানুষজনকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং সে উপলক্ষে এন্তার লিখেছেন ইসলামি এবং অনুরূপ গীতগান (যেমন 'বাজল কিরে ভোরের সানাই' বা 'মোহাম্মদ মোর নয়নমণি' ইত্যাদি) তখন তা দেশের গ্রামেগঞ্জে, ক্ষেতখামারে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আবেগের ঢেউ তুলেছে। কিন্তু এসব গীতগান এবং প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে ওঠেনি। বরং সে ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ছিল বড়ো কথা।

কিন্তু তাঁর নিজস্ব পথের ব্রতযাত্রায় নজরুল ছিলেন অটল, নির্ভীক ও আন্তরিক। সেখানে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্কীর্ণ-মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করেনি। নির্ভীক সৈনিকের মতো তিনি সেসব অগ্রাহ্য করেছেন। এগিয়ে গেছেন তাঁর হিসাব-নিকাশমতো স্থির লক্ষ্যে। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি সম্প্রদায়গত ক্ষেত্রে– সব কিছুতেই যেমন ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে তেমনি সাহিত্যসৃষ্টির ভাষ্যে।

তবু স্বীকার করতে হয় যে, স্বদেশচেতনা ও স্বদেশ-মুক্তির ক্ষেত্রে নজরুল পূর্বাপর একটি স্থির আদর্শে স্থিত থাকতে পারেননি। তেমন মানসিক স্থৈর্য তাঁর ছিল না। একটি স্থির রাজনৈতিক যাত্রায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে না পারার কারণে কখনও মনপ্রাণ দিয়ে অহিংস-অসহযোগী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গী হয়েছেন, মনপ্রাণ দিয়েই হয়েছেন এবং সে সম্পর্কে লিখেছেনও প্রচুর– কবিতা, গান, নিবন্ধাদি। এমনকি 'চরকারগান' গাইতেও তাঁর বাধেনি। কিন্তু পাশ ফিরতে সময় লাগেনি।

তাই যখন বুঝেছেন বা মনে হয়েছে যে ঐ পথে কিছু হবে না, তখন চরকায় সুতো কাটার বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, মিথ্যার তাঁত বোনার কথাও বলতে দ্বিধা করেননি, আসলে রক্তাক্ত বিপ্লবপন্থার প্রতি ছিল তাঁর সর্বাধিক আকর্ষণ। কবি গীতিকার ও সম্পাদক নজরুল এদিকটাতে সময় ব্যয় করেছেন, শ্রম ব্যয় করেছেন সবচাইতে বেশি। যেমন লিখেছেন এ বিষয়ে অসংখ্য কবিতা ও গান, তেমনি উপন্যাসিকা ও অন্যান্য গদ্য রচনায় বিশেষত সাংবাদিকতায় একই চেতনা ঝলসে উঠেছে।

আবার নানা ঘটনার প্রভাবে (যেমন রুশ বিপ্লব) এবং বন্ধু মুজফফর আহমদের প্রভাবে সমাজচেতনার পথেও আকর্ষিত হয়েছেন নজরুল। লিখেছেন একরাশ সাম্যবাদী কবিতা, যেখানে তাঁর সভাবসুলভ রোমান্টিকতাই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। লাঙ্গল বা গণবাণীর মতো পত্রিকা সম্পাদনা করে বা লেবার স্বরাজ পার্টির মতো গণমুখী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে সে পথে তাঁর আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। লাঙলের ফলায় নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য, বিত্তহীনদের জন্য আবেগের কর্ষণে দ্বিধা করেননি।

এসব সত্ত্বেও সমালোচকদের বিশ্বাস স্বভাবধর্মে নজরুল ছিলেন বিপ্লববাদের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট। এমনি করে নানপথের বৈচিত্র্যময় পরিক্রমায় ফণিমনসা বনে কাঁটায় রক্তাক্ত হওয়াই বুঝি ছিল তাঁর ভবিতব্য। তাঁর সমকালীন কোন কবির মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা অর্থাৎ বৈচিত্র্যময় আপাত-বিরোধী শৈল্পিক চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। নজরুল এদিক থেকে অনন্য ও বিশিষ্ট, আর ঐ বৈশিষ্ট্যের গুণেই তিনি তারুণ্যকে মাতিয়েছিলেন, যা তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির শিকড় ধরে সেখানে দুইয়ের সমন্বয় বা 'গ্রাফটিং'-এর স্বপ্ন নজরুল দেখেছিলেন এবং সেদিকে তাঁর সময় ও মেধা ব্যয় করেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন একটি সমন্বিত ও সঙ্কর সাংস্কৃতিক ও জাতীয় চরিত্রের সৃষ্টির, তা অভিনব না হলেও ছিল অসম্ভবের সাধনা। তবু নজরুল আপন বিশ্বাসমতো সে অসম্ভবের স্বপ্নই বরাবর দেখেছেন। তাঁর কর্মে, উপলব্ধিতে এবং শৈল্পিক সৃষ্টিতে সে অসম্ভবের সাধনাই করে গেছেন বরাবর। ফলাফলের দিকে নজর দিয়ে এবং না দিয়েই তা করে গেছেন।

আমাদের কবি

করুণাময় গোস্বামী ॥ নজরুলের সৃজনশীল জীবনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৪২ সালের মধ্যভাগে। নিদারুণ ব্যাধির আক্রমণে মানসিকভাবে তিনি পঙ্গু হয়ে যান। এর পর তো প্রায় ছয় দশক পার হয়ে গেল। নজরুল এখনো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রাণবন্ত, প্রগাঢ় প্রেরণাদাতা হিসাবে, আমাদের কবি হিসাবে। রবীন্দ্রনাথের যেমন, নজরুলেরও তেমনি, তাঁদের প্রধান পরিচয় তাঁরা কবি। তাঁদের সকল শ্রেণীর কাজে, পদ্যে, গদ্যে, গানে, কবিত্বের উচ্ছ্বাসই প্রমূর্ত হয়ে ওঠে।

এখনো তিনি আমাদের কবি কেন? এর হিসাবটা কী? ব্যাপারটা কি এমন যে, তাঁকে যখন জাতীয় কবি হিসাবে আমরা মান্য করি, তখন তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হোন আর নাইবা হোন, জাতীয় কবি হিসাবে তিনি আমাদের কবি। এও এক রকমের ব্যাখ্যা। এমন হতেই পারে। পৃথিবীতে অনেক দেশে এমন অনেক জাতীয় কবি আছেন যাঁরা এক সময় সেই সব দেশের জাতীয় মানসকে পরিপুষ্ট করেছিলেন, জাতীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁরা সচল জীবনের সজীব সঙ্গী নন। তবু তাঁরা জাতীয় কবি। সেসব দেশের মানুষ বলতেই পারে, তিনি আমাদের কবি। সেখানে কবির অবস্থান ঐতিহাসিক, বর্তমান দিনের বা আগামী কালের নয়।

জাতীয় কবি হওয়া সত্ত্বেও নজরুল এই অর্থে আমাদের কবি নন। তিনি আমাদের প্রতিদিনের সচল জীবনের সজীব সঙ্গী। এ কথা সত্য যে, নজরুল যেভাবে কবিতা লিখতেন, তাঁর ভাব প্রকাশের রীতিটি যেমন ছিল, এখন তেমনভাবে কবিতা লেখা হয় না, এখনকার কবিতা ও তখনকার কবিতা বলে একটা জিনিস দাঁড়িয়ে গেছে, নজরুল যেভাবে তাঁর গদ্য নির্মাণ করতেন, এখনকার গদ্য তেমন নয়, সময় এগিয়ে চলে, ভাষাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয়। পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই আসে। যথার্থ প্রেরণা দানের শক্তি যাঁর থাকে, তাঁর প্রেরণাদাতার ভূমিকা কিন্তু অব্যাহত থাকে। কবিতা নির্মাণকলা বা গদ্যরীতি কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। প্রাসঙ্গিক থাকে তাঁর প্রেরণা দানের বিষয়গুলো। উদারহণ হিসাবে নজরুলের প্রথম দিককার একটি সম্পাদকীয় স্তম্ভ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত, মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসঙ্কোচ-দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইতে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁজরাপারা বক্ষ, সুত-শোণিত-লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না। তোমার পুত্র শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠে না, মা! সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগর-পার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীরপুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সেদিন তাহাকেই হয়ত তোমার বেশি করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সেদিন আর চোখের জল ফেলিয়ো না, মা! বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সেদিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো।

এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।

(১৯-এর পাতায় দেখুন)

আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান– ঐ শ্মশানভূমিতে– শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না, ভুলিয়ো না। আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বোনে বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।

এখন এমনি ভাষায় সম্পাদকীয় স্তম্ভ লেখা হবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতাই আমাদের টানবে এমনি লেখার মর্মে। কী বক্তব্য এই স্তম্ভাংশের? প্রথমেই আছে কাজী নজরুল ইসলামের প্রাণপ্রিয় বিষয় ভারতের স্বাধীনতা। মাতৃরূপে ভারতবর্ষকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যাঁরা আত্মাহুতি দিলেন, তাঁদের সেই আত্মাহুতি একটা খুবই বড় বিষয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় বিষয় অপরিমেয় রক্ত ও অগণিত প্রাণের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা। দেশমাতার মুক্তরূপ।

এরপরই আসে নজরুলের একান্ত প্রিয় অনুধ্যানের বিষয় হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি। বা বৃহদর্থে বলা সঙ্গত মানবের প্রীতির বন্ধন। তিনি দোহাই পাড়ছেন, লেখক জীবনের শুরুতেই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নামে, ভারতবর্ষে একটি আধুনিক জীবনাবহের বিকাশের নামে সাম্প্রদায়িক বিষ যেন পরিত্যাজ্য হয়।

এর সঙ্গে যদি আমরা এই সম্পাদকীয় স্তম্ভের আগেকার স্তবকটি মিলিয়ে পড়ি, তাহলে নজরুলের প্রথম দিককার সংগ্রাম-স্বপ্নের অন্য একটি দিক উন্মোচিত হয় ঃ ঐ শোন নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্রবাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। ঐ শোন তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী– আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য-অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত-সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড়-ছোট ভাই বলিয়া যেন করুণাধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া উঠে। আজ এই মহামিলনে যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগ বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক, শাশ্বত হউক।

এখানে নজরুল অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসী বলে নবযুগের যে সন্তানদের বোঝাচ্ছেন, তাঁরা হচ্ছেন গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য। এঁদের পরিকল্পনা ছিল ইংরেজ শাসক ও তাদের দেশীয় দালালদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করা। লক্ষ্য ছিল ইংরেজরা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার জন্য আবেদন-নিবেদন করে কোন কাজ হবে না। অহিংস আন্দোলনের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা আসবে না। কেননা, ইংরেজরা একদিকে যেমন তাদের সমর্থন দানের জন্য দেশের ভিতরে দালাল শ্রেণী সৃষ্টি করছে, অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে, তারা কতোটা নিষ্ঠুর হতে পারে, রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা মনুষ্যত্বের কী ভয়ঙ্কর অমর্যাদা করতে পারে। প্রতিবাদ করার মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না বাংলায়। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি জনসভার আয়োজন করতে সাহস হচ্ছিল না কারো। রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মমতার প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু কোন উপাধি ত্যাগ বা অসামান্য ভাষায় নিন্দাজ্ঞাপন যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন শক্তিকে শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করা। সে জন্য গোপন বিপ্লবী সংস্থার প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ও সমর্থন ছিল গভীর। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে গোপন বিপ্লবী সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রতি সহমর্মিতা তৈরি হচ্ছিল সে সংবাদ আমরা জানি। করাচি থেকে কলকাতা ফেরার পর গোপন বিপ্লবী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ হয়ে দাঁড়ান নজরুলের কাছে এক স্বপ্নরাজ্যের নায়ক। তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নি-বীণা' তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করে উৎসর্গবাক্যে লেখেন ঃ ভাঙা বাঙলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু। অনেকের ধারণা, অগ্নি-বীণা কথাটি নজরুল গ্রহণ করেছিলেন এর আগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি গান থেকে: অগ্নি-বীণা বাজাও তুমি কেমন করে। অগ্নি-বীণা শব্দটি নজরুল এই গান থেকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সে ব্যাপারে তিনি নিজে কিছু জানাননি। হতে পারে, গানের এই শব্দটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। নাও হতে পারে। নজরুল নিজেই এই অগ্নি-বীণা কথাটি স্বাধীনভাবে তৈরি করে থাকতে পারেন। যে অগ্নিযুগের প্রেরণায়, অগ্নিযুগের বীর সন্ন্যাসীদের আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে, অগ্নিযুগের বীর পুরোহিতকে উৎসর্গ করবেন বলে মনস্থির করে তিনি কবিতা সঙ্কলনটি প্রস্তুত করলেন, তার নাম অগ্নি-বীণা ছাড়া আর কী হতে পারে? অগ্নিযুগের সংগ্রামী পটভূমিতেই নজরুল লিখেছিলেন উপন্যাস কুহেলিকা। নায়ক জাহাঙ্গীর নজরুলের নিজেরই স্বপ্নের মানুষ। তাঁর প্রিয় স্বাধীনতাযোদ্ধার প্রতীক।

মূল কথায় ফিরে আসা যাক। কথাটি ছিল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত জাতীয় কবি মাত্র নন নজরুল। তিনি সাম্মানিক দূরত্বে বসিয়ে রাখার বিগ্রহ মাত্র নন। তিনি আমাদের নিত্যদিনের সচল জীবনের সজীব সঙ্গী। নবযুগে কাজ করার সময় তাঁর প্রথম দিককার একটি সম্পাদকীয় স্তম্ভ আজও আমাদের কাছে কতো প্রাসঙ্গিক সে কথাটি বলাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

উদ্ধৃত স্তবকের শুরুতেই তিনি উল্লেখ করলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্বের কথা এবং এর সঙ্গে যুক্ত করলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে অগণিত মানুষের আত্মদানের কথা। দেশ যদি মা হয়, নজরুলের কাছে দেশ মা-ই ছিলেন, দেশকে মাতৃস্বরূপ জ্ঞানের যে সুদীর্ঘ ভারতবর্ষীয় ধারা নজরুল তাকে অনুসরণ করতেন, তাহলে আত্মদানকারীরা মায়ের সন্তান। মৃত সন্তানদের জন্য সৃষ্ট তীব্র শোকস্রোতে সিক্ত দেশমাতা দাঁড়িয়েছেন স্বাধীন বিশ্বরাষ্ট্রের সভায় জীবিত সন্তানদের কোলে, কাঁখে নিয়ে। এই দৃশ্যটি, এই প্রসঙ্গটি বাংলাদেশের ব্যাপারে কতো প্রাসঙ্গিক। পাকিস্তানি নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনের শেষে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়ে স্বাধীন বিশ্বরাষ্ট্রসভায় বাংলাদেশের উদ্ভাস ঘটল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে। বাংলাদেশ মাতা স্বাধীন দেশের মর্যাদায় দাঁড়ালেন, নজরুলের ভাষায় 'সুত-শোণিত-লিপ্ত' হয়ে।

কারা এই আত্মদানকারী পুত্র! নজরুল যাঁদের বলেছেন 'অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসী' এঁরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা, এঁরা গুপ্ত বিপ্লবী গেরিলা, ওঁরা বুঝেছিলেন, নজরুলের জাহাঙ্গীর যেমন বুঝেছিলেন, পাকিস্তানি ফৌজও তাদের দালালদের খতম করতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। নজরুল কখন এই ধারণায় পৌঁছলেন যে, ইংরেজদের ত্রাসিত করে বাধ্য না করলে তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবে না? জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর। আমাদের স্বাধীনতাকামী মানুষ যখন বুঝতে পারলেন, আলোচনা নয়, সশস্ত্র প্রতিরোধই হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র ভিত্তি? ২৫ মার্চের গণহত্যার পর ঠাণ্ডা মাথায় নিরস্ত্র মানুষকে এমন ব্যাপক হারে খুন করা সম্ভব, এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কোন দ্বিধা রইল না যে, আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প নিয়ে শত্রুকে খতম করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নজরুলের অগ্নিযুগের অগ্নি-বীণা আবার বাজল বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে। ২৫ মার্চ জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের সংগ্রামকে গ্রথিত করল।

সম্পাদকীয় স্তম্ভটির সর্বশেষ স্তবকে নজরুল উদাত্ত আহ্বান জানালেন সাম্প্রদায়িক প্রীতির। কী আবেদনস্পন্দিত ভাষায় বললেন ঃ এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান– ঐ শ্মশানভূমিতে– শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন।

নজরুল স্বাধীনতাযুদ্ধে নিহত মুক্তিকামী ভাইদের স্মৃতির দোহাই দিয়ে বলছেন, আমরা যেন আত্মবিসর্জনের পবিত্র পটভূমিতে অবস্থান করে নিজেদের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে ভাই বলে পরস্পর মিলিত হই। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের সচেতন মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও তো তাই। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, গণতন্ত্রকে যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হয়, বর্তমান কালে যাকে সুশীল সমাজ বলা হয়, সেই সুশীল সমাজ যদি বাংলাদেশে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে এর সর্বপ্রধান সামাজিক ভিত্তি হবে কী? এর ভিত্তি হবে সর্বজনীন মানবাধিকার, যার প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। প্রগতির পক্ষে যাঁরা কাজ করেন, দেশের সমৃদ্ধির জন্য যাঁরা ভাবেন, তাঁরা নিয়তই সাম্প্রদায়িক প্রীতির কথা বলছেন। বলছেন যে, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। শুধু এই সম্পাদকীয় স্তম্ভে নয়, নজরুল সারাজীবন সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্যই কাজ করেছেন। জীবনের সর্বশেষ ভাষণটিতে পর্যন্ত বলে গেছেন, তাঁর স্বপ্ন ছিল সাম্প্রদায়িকতামুক্ত দেশ গড়ে তোলার। সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রামেও তিনি আমাদের প্রেরণাদাতা সাথী।

যাকে আমরা প্রগতিশীল সমাজভাবনা বলি, যার জন্য বাংলাদেশে এখন সতর্ক সংগ্রাম করতে হচ্ছে, সে ছিল নজরুলেরও মরণপণ সংগ্রামের বিষয়, এর জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যে মর্মযাতনা ভোগ করেছেন, সে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে আছে। নজরুলের সেই ঐতিহাসিক পথ চলা এখনও শেষ হয়নি। তিনি এখনও আমাদের সঙ্গে পথ চলছেন, ভবিষ্যতেও চলতে থাকবেন। প্রগতির পথ দীর্ঘ, আমাদের দেশে সে পথ অতি দীর্ঘ বলেই

মনে হচ্ছে। স্লোগান কম্পিত দীর্ঘ পথ চলায়, আমাদের প্রগতির সংগ্রামে আমাদের কবি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। এই প্রাসঙ্গিকতায়ই কাজী নজরুল ইসলাম থাকবেন আমাদের সচল জীবনের সজীব সঙ্গী হয়ে। জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

'অঘ্রানের সওগাত' আর 'বার্ষিক সওগাত'

আবদুল মান্নান সৈয়দ ॥ অঘ্রানের সওগাত–কবিতাটিকে যে-অর্থে আমি গ্রহণ করেছিলাম, 'সওগাত' পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টোতে উল্টোতে তার অন্য একটি মানে খুলে গেল। আমি মনে করেছিলাম, এবং কবিতাটি পড়লে যে-কারো মনে হবে, একটি সম্পন্ন বাঙালি-মুসলমান চাষী গৃহস্থের জীবনযাপনের অপরূপ চিত্রণ এই কবিতাটি। কিন্তু 'সওগাত' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই একটি বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল আমার। আশ্বিন ১৩৩৩-এর 'সওগাতে' ছোট্ট একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে ঃ

১লা অগ্রহায়ণ 'সওগাতে'র বার্ষিক স্মৃতিউৎসব। এ উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবে বাঙলার মুসলমান সাহিত্যমোদীগণ।

তারপরই যখন দেখছি অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সংখ্যার প্রথমেই 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতাটি, তখন তার ভিতরার্থ মুহূর্তে উন্মোচিত হয়ে গেল। এ আর এক অর্থে সওগাত পত্রিকারই শুভ সূচনামূলক আনন্দোৎসব। তারপর এক এক করে জট খুলল।

'সওগাত' পত্রিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের ষষ্ঠ সংখ্যায় নজরুলের 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল আষাঢ় ১৩৩৩ সংখ্যায়। হঠাৎ মাঝখানে, অগ্রহায়ণ মাসে, 'সওগাতে'র 'বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব' কেন?– তখন, লক্ষ্য করে দেখলাম, অগ্রহায়ণ ১৩২৫-এ (১৯১৮) 'সওগাত' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব', তাই অগ্রহায়ণ মাসের হিশেবেই।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩২৫-এ। বছর তিনেক চলেছিল। সূচনারম্ভে ছিল মিসেস আর এস হোসেন (বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন)-এর কবিতা 'সওগাত'। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'সওগাত' প্রকাশিত হয়েছিল আষাঢ় ১৩৩৩ (১৯২৬)-এ। দেশবিভাগ-কাল পর্যন্ত চলেছিল এই পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রথমে ছিল সৈয়দ এমদাদ আলীর গদ্যরচনা, 'শুভাশিস'। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সওগাতে'র মাঝখানে বিরতি পড়েছিল কয়েক বছরের। তাহলেও হিশেব ধরা হয়েছিল এই নবপর্যায় প্রথম বর্ষকে– চতুর্থ বর্ষ হিশেবে। এই চতুর্থ বর্ষেই (১৯২৬ সালে/১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) যখন অগ্রহায়ণ মাস এল, তখনই 'সওগাতে'র জন্ম-মাস হিশেবে নজরুলের 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতা দিয়ে পত্রিকা শুরু হল।

তৃতীয় পর্যায়ে 'সওগাত' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে, ঢাকা থেকে। আগের দু'বার বেরিয়েছিল কলকাতা থেকে।

'সওগাতে'র প্রথম বর্ষেই নজরুল ইসলামের চারটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি 'সওগাতে'র প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) প্রকাশিত 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটি দিয়েই নজরুল ইসলামের সাহিত্যযাত্রা শুরু হয়েছিল। সওগাতের প্রথম বর্ষের চারটি লেখার মধ্যে ছিল নজরুলের ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। ১৩২৬ সালে অর্থাৎ নজরুলের আত্মপ্রকাশের বছরেই তিনি বহুচারী লেখক হিশেবে দেখা দিয়েছিলেন।

১৩৩৩ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সওগাত' প্রকাশিত হতে হতে এই মাত্র বছর সাতেকের মধ্যে নজরুল অনেকখানি পথ অতিক্রম করেছেন। চিরকালের মতো চিহ্নিত হয়ে গেছেন 'বিদ্রোহী কবি' হিশেবে। তবে খানিকটা বিস্মিতই হতে হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় তাঁর অনুপস্থিতি দেখে। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সওগাতে'র চতুর্থ সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৩৩) নজরুল প্রথমবার অবতীর্ণ হলেন, পত্রিকার প্রথমেই, 'সর্বসহা' কবিতা (কবিতাটি বিরজাসুন্দরী দেবীর উদ্দেশে রচিত, পরে স্থান পায় সর্বহারা কবিতাগ্রন্থের উৎসর্গপত্র হিশেবে)। নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গ পত্রিকায় আগেও এসেছে অবশ্য, পরে তো বটেই। এমনকি ঐ আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যাতেই সাহিত্য ও 'যুগধর্ম' প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, 'মোসলমান অধিক দিন বাংলা সাহিত্যে নামে নাই। কিন্তু এই অল্পদিনেই নজরুল ইসলাম দেখা দিয়াছে। বাংলায় গীতিকাব্যে যখন সুরা, সুন্দরী ও স্বর্গ লইয়া মাতোয়ারা হইতে হইতে অবসাদে মৃতকল্প হইয়া গিয়াছিল, যখন ওদিকে অগ্রসর হইবার আর কোনো পথই ছিল না, যখন কবি-প্রিয়ার ধ্যানে নিতান্ত অকবিরাও অবসন্ন নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময় নজরুল ইসলাম তাঁর কাড়া-নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে বাঙালির হৃদয়-দুয়ারে উপস্থিত হইয়া তাকে এমন সবল ঝাঁকুনি দিয়াছে যে, তার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। বাংলা গীতিকাব্যের নূতন তোরণদ্বার খুলিয়া গিয়াছে।' 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন যেহেতু 'সওগাত' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে, তাই সওগাতের জন্ম-মাস হিশেবে ১৩৩৩-এর অগ্রহায়ণ। মাসটিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৩৩৩-এর অগ্রহায়ণ মাসে মাসিক 'সওগাতে' নজরুলের 'অঘ্রানের সওগাত' প্রকাশিত হল। আর ঐ অগ্রহায়ণ মাসেই 'বার্ষিক সওগাত' প্রকাশের আয়োজন করলেন তিনি। বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে যায় অবশ্য কয়েক মাস। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন তাঁর বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ (১৯৮৫) গ্রন্থে।

সওগাত থেকে নতুন ও আকর্ষণীয় কিছু বের করার চিন্তা সব সময় আমার মাথায় খেলতো। নবপর্যায়ের 'সওগাত' প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই আমার মনে খেয়াল চাপল, অনেক লেখা ও ছবিসহ খুব বড় আকারে বার্ষিক সওগাত বের করবো। চিন্তার সাথে সাথেই ১৩৩৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা (নবপর্যায় প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) 'সওগাতে' 'বার্ষিক সওগাতে'র বিজ্ঞাপন ছেপেছিলাম।

বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিলঃ "মুসলিম বাংলার প্রথম সচিত্র সাহিত্য বার্ষিকী 'বার্ষিক সওগাতে' বহুবিধ সরস রচনা– প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, মুসলিম জগতের চিত্রভূষিত বিবরণ, অনেকগুলি ত্রিবর্ণ ও একরঙা হাফটোন ছবি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতির সমাবেশ থাকিবে। আমরা বাংলার সাহিত্য রসিকদিগকে বার্ষিক 'সওগাতে'র আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি। সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানের দৈন্য ও নৈরাশ্যের মধ্যে আশার উজ্জ্বলবর্তিকা লইয়া বার্ষিক সওগাত তাঁদের দ্বারস্থ হইবে।/এর পূর্বে আমাদের কোনো পত্রিকার সচিত্র বার্ষিকী প্রকাশিত হয়নি।

বার্ষিক সওগাত' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে। এত জনপ্রিয় হয় যে পর পর তিনটি সংস্করণ বের করতে হয়েছিল। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন, 'তৎকালীন ভারতের কোনো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার ভাগ্যে পর পর এতগুলি সংস্করণ প্রকাশের সম্মান অর্জিত হয়নি।' ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ বহুচিত্র, লেখকদের ফটো ও পরিচিতি, কার্টুন ইত্যাদি সুশোভিত পত্রিকাটিতে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি তো ছিলই। প্রথমেই ছিল নজরুলের কবিতা 'বার্ষিক সওগাত'। নজরুলের আরো একটি কবিতা ছিল 'খালেদ'।

'অঘ্রানের সওগাত', 'বার্ষিক সওগাত', 'খালেদ' প্রভৃতি কবিতা যখন লিখছেন নজরুল, ১৯২৬ সালে, তখন তাঁর আবাস কৃষ্ণনগরে। ১৯২৬-২৮ – এই তিন বছর নজরুল ছিলেন কৃষ্ণনগরে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন জানিয়েছেন ঃ

কাজী নজরুল ইসলাম তখন কৃষ্ণনগরে বাস করছিলেন। বাংলার মুসলিম সমাজে প্রথম সাহিত্যবার্ষিকী প্রকাশিত হবে জেনে তিনি এতটা খুশি হয়েছিলেন যে, বার বার পত্র লিখে জানতে চাইতেন আর কত দেরি। তিনি বার্ষিকীর জন্য তিন-চারটা লেখা দেবেন বলে অতি উৎসাহের সাথে আমাকে জানালেন। কিন্তু জ্বরাক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে 'বার্ষিক সওগাত' নামে কবিতাটি লিখে পাঠালেন। জ্বরের সংবাদ পেয়ে আমি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে পাঠালাম কৃষ্ণনগরে কবিকে দেখে আসবার জন্য।/কবি লেপের নিচে থেকেই খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে বললেন, নিয়ে আয় কাগজ আর

কলম।/খান মঈনুদ্দীন বললেন, এত জ্বরের মধ্যে কাগজ-কলম এনে কি হবে?/কবি বললেন ঃ এখন লেখাটা জমবে ভালো।/প্রবল জ্বরের মধ্যেই তিনি লিখে ফেললেন বার্ষিক 'সওগাতে'র জন্য সুদীর্ঘ কবিতা 'খালেদ'।

'সওগাতে'র উদ্যোগে 'বার্ষিক সওগাত'-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৭ সালের ১৩ই জানুয়ারি রোববার অপরাহ্ণে। সুধী কবি-সাহিত্যিকগণ সমবেত হয়েছিলেন। 'সওগাত' পত্রিকার মাঘ ১৩৩৩-এর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সওগাত প্রীতি সম্মেলন শিরোনামে ঐ অনুষ্ঠানের বিবরণ ছাপা হয়েছিল। তাতে উল্লেখ দেখছি না; তবে 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ'-এ জানানো হয়েছে ঃ 'কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ অবস্থায় কৃষ্ণনগরে থাকায় এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই। তিনি এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তবে তাঁর 'বার্ষিক সওগাত' ও 'খালেদ' এ দু'টি কবিতা সম্মেলনে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পড়া হইয়াছিল।' 'বার্ষিক সওগাত' কবিতাটি মাঘ সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

'অঘ্রানের সওগাত' কবিতার রচনার স্থান-কাল : কলকাতা, ১০ই কার্তিক, ১৩৩৩ (এই রচনাকাল থেকেও বোঝা যাচ্ছে ঃ এটি 'সওগাত' সম্পাদকের অনুরোধে রচিত)। কবির জিঞ্জীর (১৯২৭) কবিতাগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বার্ষিক সওগাত', দ্বিতীয় কবিতা 'অঘ্রানের সওগাত'। 'সওগাত' সম্পাদক জানিয়েছেন, 'বার্ষিক সওগাত' ও 'খালেদ' কবিতা দু'টিতে মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ এবং ভাব ও ভাষার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।' আসলে এটি তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া। 'সওগাত' পত্রিকাটি ছিল বাঙালী মুসলমান সমাজের মুখপত্র, বাঙালী মুসলমান লেখকদের বিকাশে এককভাবে সওগাতের ভূমিকাই সর্বাধিক। তবে, এ কথাও স্মরণীয় যে, 'সওগাত' ছিল প্রমুক্ত মনের পত্রিকা।

এমনিতেই নজরুলের অভ্যাস ছিল সাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা। সেকালে একটি রেওয়াজই ছিল সাময়িকপত্রের উদ্বোধন বা বিশেষ সংখ্যার জন্য তার নাম নিয়ে শুভেচ্ছামূলক কবিতা বা গদ্য রচনার। নজরুল নিজে এ রকম বেশকিছু কবিতা লিখেছিলেন– 'নওরোজ' পত্রিকা নিয়ে 'নওরোজ' কবিতা, 'নকীব' পত্রিকা নিয়ে 'নকীব' কবিতা। 'বার্ষিক সওগাত' আর 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতা দু'টি দিয়েই বোঝা যায় নজরুলের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিমাপ। মুসলমানী বা ইসলামী শব্দ ব্যবহারে (আবার তার ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দগুলো মুসলমান সমাজে নিত্য ব্যবহৃত) শুধু নয়– একটিতে বৈশ্বিক পটভূমি আরেকটিতে দেশজ পরিপ্রেক্ষিত। 'বার্ষিক সওগাত' কবিতায় ইসলামী বিশ্বের আবহ :

আরবের প্রাণ, ফারেসের গান, বাজু নৌ-তুর্কির,
দারাজ দিলীর আফগানী দিল্, সুরের জখমী শির।
নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, ইরাকের বুটা তখ্ত,
বন্দী শ্যামের জিন্দানখানা, হিন্দের বদবখত!–
তাঞ্জাম ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখোনি বাকি,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখী।

আর দেশজ আবহ 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতায় :

মিয়া ও বিবিতে বড় ভাব আজি, খামারে ধরে না ধান।
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!
'শাশবিবি' কন, 'আহা আসে নাই
কতদিন হল মেজলা জামাই।'
ছোট মেয়ে কয়, 'আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান!'
দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো বিবি লবেজান!

দু'টি কবিতাই শেষ হচ্ছে নজরুলী অস্তিবাদিতায়, ' বেদনার বানে সয়লাব সব, পাইনে সাথীর হাত,/আনো গো বন্ধু নূহের কিশতী– বার্ষিকী সওগাত।' ('বার্ষিক সওগাত') 'গোলা ভরে রাখ সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয়।/বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিক 'সওগাত' পত্রিকার জন্যে 'সওগাত' শিরোনামেই গদ্য লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিতা লিখেছিলেন বেগম রোকেয়া ও গোলাম মোস্তফা। 'সওগাতে'র একেবারে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২৫) 'সওগাত' নামে কবিতা লিখেছিলেন বেগম রোকেয়া। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২৬) 'সওগাত' নামে কথিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন জানিয়েছেন, 'সওগাত' পত্রিকার নামটি 'রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দ হয়েছিল'। 'সওগাত' পত্রিকার নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৩৩) গোলাম মোস্তফা লিখেছিলেন 'সওগাত' নামে কবিতা। এঁদের প্রত্যেকের রচনায় আপনাপন কবিস্বভাবের মুদ্রা চিহ্নিত। নজরুলের 'বার্ষিক সওগাত' ও 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতাদ্বয়ে তাঁরই নিজস্বতা স্বাক্ষরিত। মর্ত্যপৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কবিতা দু'টি যেন অমর্ত্যলোককে স্পর্শ করে আছে।

৩০ বৈশাখ ১৪০৮ (২০-এর পাতায় দেখুন)

নজরুল–রচিত ॥প্রয়াণ-গীতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ॥ কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনে প্রচুর প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেছেন। এই প্রশস্তিমূলক কবিতা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রচিত কবিতা, দ্বিতীয় হচ্ছে শ্রদ্ধেয় কোন ব্যক্তির নামে তাঁর কোন গ্রন্থ উৎসর্গ করে নিবেদিত উৎসর্গ কবিতা, তৃতীয় ধারায় আমরা লক্ষ্য করি সর্বজন শ্রদ্ধেয় কোন ব্যক্তিত্বের পরলোকগমনের পর রচিত প্রয়াণ-গীতি।

লক্ষণীয় বিষয়, নজরুল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ করে রচনা করেছিলেন প্রথম প্রশস্তি কবিতা "দিল-দরদী" (মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮) এবং এই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনের পরই তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রথম প্রয়াণ-নীতি।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২২ খ্রিস্টাদের ২৫শে জুন (১০ আষাঢ়, ১৩২৯) পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মরণে নজরুল ইসলাম তিনটি কবিতা রচনা করেন– 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ', 'সত্য-কবি' ও 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি'। কবিতাগুলি পরে ফণিমনসা (শ্রাবণ ১৩৩৪) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ' কবিতাটি প্রথমে 'বিজলী' পত্রিকার ১৬ আষাঢ়, ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর প্রথম চরণ

"আজ আষাঢ়-মেঘের কালো কাফনের
আড়ালে মু'খানি ঢাকি
আহা কে তুমি জননী কার নাম ধ'রে
বারে বারে যাও ডাকি?"

এখানে কালো কাফনের রূপকল্পটি অপূর্ব সুন্দর। নজরুলের সাহিত্যে বিভিন্ন কাব্যে বা গ্রন্থে ট্র্যাজিক-আবহকে 'কাফন', 'জানাজা' 'কবর' বা 'গোরস্থান'-এর উপমা বিশেষ করুণ-রসের সৃষ্টি করেছে। যেমন 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আমরা দেখি ''সন্ধ্যার নামাজ, যেন মৃত দিবসের জানাজা সামনে রেখে তার আত্মার শেষ কল্যাণ কামনা।'' এই উপন্যাসেই সেজ বউয়ের ছেলের মৃত্যুর বর্ণনায় নজরুল লিখেছেন–

''শবেবরাত রজনীতে গোরস্থানের মৃৎ-প্রদীপ যেমন ক্ষণেকের তরে ক্ষীণ আলো দিয়ে নিবে যায়, তেমনি।''

'সত্য-কবি' কবিতাটি প্রথমে 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণে' শিরোনামে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় (প্রথম চরণ-'অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য যে গেল চলে')। এ কবিতার একাংশে কবি সুকৌশলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলীর পরিচয় তুলে ধরেছেন যেমন–''আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে মণি-মঞ্জুষা ভরা/বেনু-বীণা আর কুহু-কেকা-রবে আজো শিহরায় ধরা,/জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র-আবির' ফাগুয়ার হোমশিখা–/'বহ্নি বাসরে' টিটকারী 'দিয়া হাসিল' হসন্তিকা।''

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতির প্রথম চরণ–''চল চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে।'' ১৯২২ সালের ২৫ জুন সন্ধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের স্মরণে কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় নজরুল স্বরচিত গানটি গেয়ে প্রয়াত কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়াও এই দুই কবির কবি-মানসেরও বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান। উভয় কবির রচনায় সমকালীন ঘটনার প্রভাব, নিপীড়িত জনগণের প্রতি মমত্ববোধ, ছন্দের বৈচিত্র্য, আরবী ফারসী শব্দের চারুপ্রয়োগ ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

কবি শরদিন্দু রায়ের অকালমৃত্যু উপলক্ষে নজরুল 'ইন্দু-প্রয়াণ' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসের কোন এক তারিখে তিনি বহরমপুর জেলে বসে লেখেন। শরদিন্দু রায়কে কবি 'বাঁশির দেবতা' বলে সম্বোধন করেছেন। এ কবিতায় শরদিন্দু রায়ের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে এই শরদিন্দু একজন সত্যভাষী যুবক, প্রাণচঞ্চল হাসির অধিকারী, সুন্দর বাঁশি বাজাতেন এবং গঙ্গার তীরে বসে দুই কবির গানের আসর বসত।

বরিশালের কর্মযোগী রাজনীতিবিদ অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) ৭ নবেম্বর, ১৯২৩ পরলোকগমন করেন। নজরুল তাঁরই স্মৃতি স্মরণে 'অশ্বিনীকুমার' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি 'লাঙল' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। 'ফণিমনসা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতার শেষে রচনাকাল দেয়া হয়েছে 'হুগলি, মাঘ ১৩৩২'। কবিতাটি অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যুর পর পরই রচিত হয়নি। সম্ভবত পরবর্তীকালে কোন বিশেষ উপলক্ষে এ কবিতা রচিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম এই হোতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিতাটি রচিত। তাঁর মতো বিপ্লবীর পুনরায় আবির্ভাব কামনা করে কবি এ কবিতায় লিখেছেন–'অসুর নিধনে কবে আসিবে আবার'।

'বেঙ্গল টাইগার' নামে খ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) ১৯২৪ সালের ২৫ মে পরলোকগমন করেন। নজরুল তাঁর স্মরণে রচনা করেন 'আশু-প্রয়াণ গীতি'। এ প্রয়াণ-গীতিটি প্রথমে ১৩৩১-এর আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ভাঙ্গার গান' (শ্রাবণ-১৩৩১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে কবি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লিখেছেন–

"বাঙ্‌লার শির্, বাঙ্‌লার শির
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর
সহসা ওপারে অস্তমান।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দেশহিতৈষণা নজরুলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর পরই শোকার্ত নজরুল পাঁচটি কবিতা এবং পরে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আর একটি কবিতা রচনা করেন।

১৩৩২ সালের ২ আষাঢ় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিঙে পরলোকগমন করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ শুনে নজরুল 'অর্ঘ্য' নামে একটি তাৎক্ষণিক গান রচনা করেন। রচনাকাল ১৩৩২, ৩ আষাঢ়। দেশবন্ধুর শবাধারে গানটি মালার সঙ্গে গেঁথে দেয়া হয়।

১৩৩২, শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে নজরুলের আর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়–'অকাল সন্ধ্যা'। পাদটীকায় লেখা ছিল 'স্বর্গীয় দেশবন্ধুর শোকাযাত্রার গান'।

১৩৩২-এর আষাঢ় সংখ্যা 'বিজলী'তে নজরুলের 'সান্ত্বনা' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১২ আষাঢ় তারিখের 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নজরুলের আর একটি কবিতা–'ইন্দ্র-পতন'। ঐ কবিতায় নজরুল মহানবী (দঃ) হযরত মোহাম্মদের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তুলনা করায় সমকালীন মুসলিম সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। 'মোসলেম জগৎ' ও 'মোসলেম দর্পণ' পত্রিকায় ঐ কবিতার বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নজরুল অবশ্য পরে 'চিত্তনামা' গ্রন্থে বিতর্কিত চরণ দু'টি বাদ দেন। 'ইন্দ্র-পতন' কবিতাটি সম্পর্কে সমকালীন সমালোচকগণও বলে থাকেন–

'অতি-ভাষণের জন্য স্থানে স্থানে ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমির দোষে ভারাক্রান্ত'।

১৩৩২-এর শ্রাবণ সংখ্যা 'কল্লোলে' নজরুলের আর একটি চিত্তরঞ্জন-প্রশস্তি প্রকাশিত হয়–'রাজ-ভিখারী'। চিত্তরঞ্জন-প্রশস্তি কবিতাগুলোর মধ্যে এই কবিতার শিল্পগুণ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে।

১৩৩২-এর শ্রাবণেই নজরুল চিত্তরঞ্জন-প্রশস্তিমূলক পাঁচটি কবিতা ও গান একত্রে 'চিত্তনামা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি নজরুল নিজেই হুগলী থেকে প্রকাশ করেন। এর প্রচ্ছদে ছিল ভারতের মানচিত্রের পটভূমিতে এক ক্রন্দনরতা রমণীর মূর্তি। ভিতরে ছিল বিষ্ণুপুরের দল-মাদল কামানের গায়ে হেলান দেয়া নজরুলের এক আলোকচিত্র। গ্রন্থমধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের কোন চিত্র ছিল না। সে জন্যই 'প্রবাসী' পত্রিকা মন্তব্য করে–

"দেশবন্ধু দাশের ছবি কোথাও নাই–ইহা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে এবং বই বিক্রির দিক হইতেও ইহা বুদ্ধির পরিচায়ক হয় নাই।"

নজরুল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ৪র্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 'তর্পণ' নামে একটি কবিতা রচনা করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় নজরুলের ১০টিরও বেশি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়। মুজাফফর আহমদের 'স্মৃতি কথায়' জানা যায়, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন জেলে ছিলেন তখন নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'ভাঙার গান' (প্রথম চরণ–কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট) রচনা করেন। নজরুল যখন জেলে অনশনব্রত পালন করেছিলেন তখন কলকাতার গোলদীঘি ময়দানে চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়, "নজরুলকে বাঁচানো বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করেন।" ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তারকেশ্বরের মোহান্তদের অনাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেন তারই সমর্থনে নজরুল রচনা করেন–'মোহঅন্তের গান' (ভাঙার গান, ১৩৩১, শ্রাবণ)।

'কল্লোল' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৫-১৯২৫)-এর স্মৃতিতে নজরুল 'গোকুল নাগ' নামেই ১৩৩২-এর ৩০ কার্তিক একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'কল্লোলে' মুদ্রিত হয়। ১৩৩২ সালে প্রকাশিত 'ফণিমনসা' গ্রন্থে এটি স্থান পায়।

কথা সাহিত্যিক গোকুল নাগ ১৩৩২ সালের ৮ আশ্বিন দার্জিলিং-এ পরলোকগমন করেন। ‘কল্লোল’ পত্রিকার সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যচর্চার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ঐ পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই নজরুলের রচনা প্রকাশিত হতো।

‘কল্লোল’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে কল্লোল-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, তার লেখক এবং কর্মীবৃন্দের সঙ্গে নজরুলের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রীতিপ্রদ সে অন্তরঙ্গতার কাহিনী বিধৃত হয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কল্লোলযুগ’ গ্রন্থে। গোকুল নাগের সঙ্গে নজরুলের যে প্রীতিময় সম্পর্ক ছিল কবি এই ‘গোকুল নাগ’ কবিতায় তা আন্তরিক আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

পরলোকগত স্কুল-ইন্সপেক্টর এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ বিএ-এর স্মরণে নজরুল ‘বাংলার আজিজ’ নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি মাসিক ‘মোহাম্মদী’ কার্তিক ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে তা ‘সন্ধ্যা’ কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। নজরুল ইসলাম যখন চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে) তখন পরলোকগত আব্দুল আজিজের ‘তামাকুমন্ডি’স্থ বাসভবনে কবি বাস করেন। খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুর নাহার মাহমুদের মাতামহ ছিলেন। আব্দুল আজিজের (১৮৬৩-১৯২৬) সঙ্গে নজরুলের কতটা পরিচয় ছিল জানা যায়নি। তবে মুসলমানদের শিক্ষা-সম্প্রসারণে আব্দুল আজিজের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা নজরুল যে অবহিত ছিলেন তা তাঁর কবিতা পাঠেই প্রতীয়মান হয়। আব্দুল আজিজকে নজরুল ‘নবযুগের মুয়াজ্জীন’ হিসাবে অভিহিত করেছেন।

মিসেস এম রহমান ১৯২৬, ২০ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। তাঁর পূর্ণ নাম মাসুদা খাতুন (১২৯১-১৩৩৩)। তিনি হুগলী জজকোর্টের উকিল খান বাহাদুর মৌলভী মজহারুল আনোয়ার চৌধুরীর কন্যা এবং শ্রীরামপুরের তদানীন্তন সাবরেজিস্ট্রার কাজী মাহমুদুর রহমান সাহেবের পত্নী ছিলেন। মিসেস এম রহমান এ দেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি সমকালীন পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। তিনি ‘মা ও মেয়ে’ নামে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ‘চানাচুর’ নামে একটি মরণোত্তর গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে নজরুল ‘মিসেস এম, রহমান’ নামে একটি কবিতা রচনা করেন এবং সওগাত, সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে লেখা এক পত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে–

“মার (মিসেস এম রহমানের) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমার সব গুলিয়ে গেল। বাড়িতে কান্নকাটি পড়ে গিয়েছিল। আপন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন মা আমায়। আমি তার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি। আমি আজ দেউলিয়া হয়ে যেন জীবনের জোয়ার-ভাটা দেখছি শুধু। মন বড় খারাপ, তাই এখন মার নামে যে কবিতাটি পাঠালাম এটাই মাঘের ‘সওগাতে’র প্রথমে দিয়ে দেবেন।”

নজরুল মিসেস এম, রহমানকে মাতৃসম শ্রদ্ধা করতেন এবং ‘আম্মা’ বলে সম্বোধন করতেন। শুধু তাই নয়, মুসলমান সমাজে শিক্ষিতজন মাত্রেই মিসেস এম, রহমানকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করতেন। মোহাম্মদ কাসেম সম্পাদিত ‘অভিযান’ পত্রিকার জন্য মিসেস এম রহমান যে শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন তা উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ‘মায়ের আশীষ’ শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

নজরুলের ‘মিসেস এম রহমান’ শিরোনামে কবিতাটি মাঘ ১৩৩৩ সংখ্যার ‘সওগাত’-এ প্রকাশিত হয়। পরে কবিতাটি ‘জিঞ্জির’ কাব্য (১৯২৮)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কবিতাটির প্রথম দু’টি চরণ এখানে উদ্ধৃত করা যায়–

“মোহররমের চাঁদ ওঠার ত আজিও অনেক দেরি,
কেন কারবালা-মাতম উঠিল এখনি আমায় ঘেরি?”

কবিতাটি কারবালা-রূপকে রচিত।

অসহযোগ আন্দোলনের সংগ্রামী পুরুষ যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪-১৯২৯)-এর স্মরণে নজরুল ‘যতীন দাস’ নামে একটি কবিতা রচনা করেন। যতীন দাস ৬৩ দিন অনশনের পর জেলে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ মারা যান। কবিতাটি পরে ‘প্রলয় শিখা’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কবি এই বিপ্লবী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন–

বুকে ছিল প্রাণ, তাই দিয়ে রণ
জিনে গেলে প্রাণহীন জাতির।
তোমার হাতের শ্বেত শতদল,
শুভ্র মহাপ্রাণ তোমার,
দিয়া গেলে তব জাতির আশিস,
তোমার হাতের নমস্কার!

‘প্রলয় শিখা’ কাব্যের একটি কবিতা ‘মনীন্দ্র-প্রয়াণ’। কাশীম বাজারের দানবীর মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তিরোধান উপলক্ষে কবিতাটি রচিত। মনীন্দ্র কুমার নন্দী বিভিন্ন দানশীল কর্মের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। এ জন্য তিনি স্যার উপাধিতেও ভূষিত হন। মনীন্দ্র নন্দীর দানশীলতার কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন–“দানবীর, এতদিনে নিঃশেষে/করিলে নিজেরে দান।”

‘দেশপ্রিয়’ নামে খ্যাত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩)-এর পরলোকগমনের পর নজরুল ‘দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের তিরোধানে’ নামে একটি কবিতা রচনা করেন। যতীন্দ্রমোহন ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। পরে তিনি ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ যতীন্দ্রমোহন ধর্মঘটী শ্রমিকদের পরিবারের ব্যয়-নির্বাহের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দান করে দেববাসীর কাছ থেকে ‘দেশপ্রিয়’ উপাধি লাভ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কারাবাস ভোগ করেন। নজরুল ইসলাম রচিত ‘দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের তিরোধানে’ কবিতাটি ১৩৪০ ভাদ্র সংখ্যা ‘মাসিক মোহাম্মদী’তে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি দীর্ঘকাল গ্রন্থাকারে অগ্রথিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ৭ আগস্ট ১৯৪১ পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর নজরুল ‘রবি-হারা’ নামের কবিতাটি রচনা করেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে কবিতাটি প্রচারিত হয় এবং পরে ১৩৪৮ ভাদ্র সংখ্যা ‘সওগাতে’ তা মুদ্রিত হয়। নজরুল এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে ‘শ্যামবাংলার হৃদয়ের ছবি’ বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালীর কত গৌরবের এবং আনন্দের ধন বিভিন্ন রূপকল্পের সাহায্যে এ কথা নজরুল আলোচ্য কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ডে কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে।

নজরুল আরেকটি রবীন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি রচনা করেন– “সালাম অস্ত-রবি।” কবিতাটি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার ভাদ্র ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল কবিতাটি গ্রন্থাকারে অগ্রথিত থাকলেও এটি একটি সুন্দর কবিতা। আরবী, ফারসী শব্দের কুশল ব্যবহারে, অনুপ্রাস-চাতুর্যে এবং রূপকল্প নির্মাণে এটি অনবদ্য। নজরুল রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাজিফ ও রুমী, আরবের ইমরুল-কায়েস-এর পাশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ‘রসিক বিধাতা’, ‘অপরূপ বিলাসে’ ‘সকল দেশের সকল কালের সকল কবিকে নিংড়ে তাদের রূপে রসে রাঙ্গিয়ে এই কবিকে যেন সৃষ্টি করেছেন। তাই কবি বলেছেন–

সকল দেশের সকল জাতির সকল লোকের তুমি
অর্ঘ্য আনিয়া ধন্য করিলে ভারত-বঙ্গভূমি ॥

এই কবিতার দুই একটি উল্লেখযোগ্য চরণ উদ্ধৃত করা যায়–
(ক) গোলাব ঝরেছে, গোলারি আতর কাঁদিয়া ফিরিছে হায়!
আতরে কাতর করে আরও প্রাণ, ফুলেরে দেখিতে চায়।
(খ) কালাম ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও!
উর্ধ্বে থাকি' এ পাষাণ জাতিরে রসে গলাইয়া দাও!!
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নজরুল ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন।
১৩৩৪ সালের আগস্ট সংখ্যা 'কল্লোলে' 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' শিরোনামে নজরুলের একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। এ কবিতা রচনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৩৩৩-৩৪ সালে 'কালি-কলম' 'কল্লোল-গোষ্ঠীর' লেখকবৃন্দ এবং তাদের রচিত সাহিত্যকে কেন্দ্র করে মোহিতলাল, সজনীকান্ত দাশ এবং 'শনিবারের চিঠি' এক অশোভন বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। নজরুল ছিলেন তাঁদের আক্রমণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। স্বাভাবিকভাবেই নজরুল এবং কল্লোল গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও সহানুভূতি কামনা করেছিল। নজরুল ঠিক এ সময়ে 'কল্লোলে' "আজি হতে শত বর্ষ আগে" কবিতাটি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই কবিতা '১৪০০ সাল' শিরোনামে 'চক্রবাক' (১৩৩৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।
রবীন্দ্রনাথ উত্তরসূরিদের উদ্দেশে '১৪০০ সাল' নামে যে কবিতা রচনা করেন, নজরুল ১৪০০ সালের উত্তরসূরিদের পক্ষে তারই উত্তর দেন। নজরুলের '১৪০০ সাল' কবিতার শিরোনামে নিচে লেখা ছিল–
"কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' পড়িয়া। রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' কবিতার বসন্ত অভিবাদন নজরুল 'অনুরাগ ভরে' গ্রহণ করে ঘোষণা করেন–
"তোমারি বসন্তগান গাহি তব বসন্ত-বাসরে–
তোমা হতে শতবর্ষ পরে।"
নজরুল ইসলাম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সাপ্তাহিক 'নাগরিক' পত্রিকার জন্য একটি লেখা চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সে পত্র পেয়ে ১৩৪২-এর ১৫ ভাদ্র নজরুলকে তার জবাবে এক পত্র প্রেরণ করেন। নজরুল সে পত্র পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে 'তীর্থ-পথিক' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি ১৩৪২-এর নাগরিক পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। নজরুল রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান শাখায় এই কবিতাটি সঙ্কলিত হয়। এই কবিতায় কবির আন্তরিক কামনা– 'আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য গীতে।'
১৩৪৮-এর ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষ জন্মোৎসব উপলক্ষে নজরুল 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' নামে কবিতা রচনা করেন। কবিতাটিতে কবি হৃদয়ের যুগপৎ আনন্দ-বেদনা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে নজরুল এ কবিতায় বলেছেন 'সৃষ্টির বিস্ময়'। এছাড়া নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে স্নেহ-দাক্ষিণ্য লাভ করেছেন, তার স্বীকৃতিও এ কবিতায় বিধৃত।
'নতুন চাঁদ' গ্রন্থে সঙ্কলিত 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' কবিতার পাশে রয়েছে আর একটি কবিতা 'কিশোর রবি'। রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লেখা এ কবিতায় নজরুল রবীন্দ্রনাথকে 'চির-কিশোর' সম্বোধন করেছেন। কবিতার শেষে কবির একান্ত কামনা– 'এ অশান্তিময় ধরা, যেন শান্তিনিকেতনে পরিণত হয়'।
রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তাঁর এক জন্মতিথি উপলক্ষে নজরুল আরেকটি কবিতা রচনা করেছিলেন–'রবির জন্মতিথি'। কবিতাটি কখন লিখিত হয় বা কখন প্রকাশিত হয় তা জানা যায়নি। এটি কবি অসুস্থ হবার পর শেষ সওগাত নামে একটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। এ কবিতায় নজরুল বলছেন– 'রবি কি অস্ত যায়?' 'রবি ডুবে গেল বলে যারা কলরব করে, তারা' অন্ধ মানব। 'নজরুল তাঁর 'রবিহারা' কবিতায় বলেছিলেন, বাঙালি ছাড়া কি হারালো বাঙালি কেহ বুঝিবে না আর। এ কবিতায়ও তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করেছেন–
কবি হয়ে এল রবি এই বাঙালায়
দেখিল বুঝিল বলো কতজন তাঁয়?
কারণ নিরক্ষর ও নিস্তেজ বাঙলায় যতদিন না অক্ষরজ্ঞান সকলেই পায় ততদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বাণী সকলের কাছে পৌছাবে না। যেদিন সকলেই অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হবে, সেদিনই যথার্থ রবির জন্মতিথি সার্থক হবে এবং মানুষ দেবে তাঁরে প্রেমপ্রীতি।
নজরুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশে প্রশস্তি কবিতা রচনা করা ছাড়াও একটি গ্রন্থ তাঁর নামে উৎসর্গ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। সে কাব্যটি হচ্ছে সঞ্চিতা (১৩৩৫)। উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল "বিশ্বকবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ শ্রী শ্রীচরণাবিন্দেষু।"
নজরুল ইসলাম শ্রদ্ধাভাজন রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী, সাহিত্যিক বা বিশেষ ব্যক্তিত্বকে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তাঁদের পরলোক গমনের পর পরই, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। কিন্তু তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরলোকগমনের দীর্ঘকাল পরে। এ কবিতাগুলো লেখা হয়েছে মহাত্মা মোহসীন, নবীনচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে।
দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসীন ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১২ সালে পরলোকগমন করেন। পরলোকগমনের বহুকাল পরে তাঁর স্মরণে দৈনিক নবযুগ পত্রিকা মোহসীন সংখ্যা নামে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। নজরুল এই বিশেষ সংখ্যার জন্য 'মহাত্মা মোহসীন' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। এই কবিতায় নজরুল মোহসীনকে উদ্দেশ করে লিখেছেন–
"ইতিহাসে নয়, মানব হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
প্রেমাশ্রুজলে লেখা রবে প্রিয় আত্মীয়স্মৃতিসম
মানবাত্মার নিত্য বন্ধু, মহাত্মা নিরুপম!"
নজরুল মোহসীন স্মরণে একটি গানও রচনা করেছিলেন। এটি কখন বা কোন্ উপলক্ষে রচিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। মোহসীন স্মরণে লেখা এই দুটি কবিতা ও গান দীর্ঘকালে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত থাকার পর 'শেষ সওগাত' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।
নজরুলের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত আরেকটি কবিতা নবীনচন্দ্র। কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ সালে পরলোকগমন করেন। এই কবির মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পরে নজরুল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম সফরে যান। তখন তিনি কবি নবীন সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ কবিতা রচনা করেন। নবীন সেনের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ের হয়ত কোন সুযোগ ঘটেনি। সে কারণেই নজরুল এ কবিতাকে বলেছেন অপরিচিতের এই পূজা নিবেদন। কবিতাটি নজরুলের একটি তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদীর তীরের এক কবি ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেব, কাশীরাম, কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণের 'অর্ঘ্যভার' নিয়ে এসেছেন কর্ণফুলী তীরে, নবীন সেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। কবির ভাষায়–
"আসিল পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব বাঙ্গালায়
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে।"

নজরুল এ কবিতায় নবীন সেনের বিভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে, উদার নবীন সেন 'মুহাম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, অমৃতাভ, যীশু' প্রমুখ মহামানবের জন্য 'সমঅর্ঘ্যপ্রীতি', নিবেদন করেছেন। আমরা কৃষ্ণের জীবনী কাব্য প্রভাস, বুদ্ধ লীলা, বিষয়ক কাব্য অমৃতাভ চৈতন্যলীলা বিষয়ক কাব্য অমৃতাভ' এবং যীশুখৃষ্ট মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য খ্রিষ্টের কথা জানি। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নিয়ে তিনি কোন কাব্য লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। নজরুল সম্ভবত নবীন সেনের উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় দিতে গিয়ে এখানে মুহাম্মদ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

নজরুল ইসলাম 'নব ভারতের হলদিঘাট' শীর্ষক একটি কবিতা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীনের স্মরণে রচনা করেন। যতীন্দ্রনাথ ১৮৮০ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৫ সালে প্রয়াত হন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একবার তিনি কুষ্টিয়ায় একটি ছোরা হাতে একটি বাঘ মারেন বলে বাঘা যতীন নামে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বৈপ্লবিক দলগুলোর সঙ্গে এক যৌথ পরিকল্পনায় বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে বালেশ্বর-এ রেল লাইন অধিকার করে ইংরেজদের কলকাতা যাবার পথ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। পুলিশ এ পরিকল্পনা জানতে পেরে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চারজন অনুচরকে ঘেরাও করে ফেলে। ইংরেজী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। এই পাঁচজন বিপ্লবী যোদ্ধা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন এবং বাঘা যতীন গুরুতররূপে আহত হয়ে একদিন পর বালেশ্বর হাসপাতালে ১৯১৫ সালে মারা যান।

নজরুল বাঘা যতীনের মৃত্যুর প্রায় ১৫ বছর পরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর স্মরণে নব ভারতের হলদিঘাট নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবি এই কবিতায় বাঘা যতীন প্রমুখের প্রাণ বিসর্জনকে বলেছেন, 'অধীন ভারত করিল প্রথম/স্বাধীন ভারত মন্ত্রপাঠ'। তিনি পরাধীনতার পাপ মুছে ফেলার জন্য অগণিত বীরের আগমনও কামনা করেন। কবিতাটি যতীন দাস ও জাগরণ শীর্ষক দুটি কবিতার সঙ্গে কবির প্রলয় শিখা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই তিনটি কবিতার উদ্দীপক বাণী তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের মনঃপুত না হওয়ায় প্রলয় শিখা কাব্যটি বাজেয়াপ্ত হয়। এ জন্য কবি ছ'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। কবি এ সময় জামিনে মুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ খ্রিঃ মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে কবি মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি, নজরুল ইসলাম প্রায় ১৫ জন ব্যক্তিত্বের স্মৃতির উদ্দেশে প্রয়াণ-গীতি রচনা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির নামে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে নজরুল প্রায় ক্ষেত্রেই এঁদের সান্নিধ্য ও স্নেহ-দাক্ষিণ্য লাভ করেছেন। কারও কারও সঙ্গে হয়ত তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু তিনি কারো প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদনে কুণ্ঠিত হননি। বিপ্লবী পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বা তাদের স্মরণ করে নজরুলের আগে বোধ করি আর কেউ কবিতা রচনায় সৎসাহস দেখাননি। নজরুল এই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি দেশ ও জাতির জন্য তাঁদের অমূল্য অবদানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এ কারণেই নজরুল রচিত এই প্রয়াণ-গীতিগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাঁশিয়াল নজরুল

'এক হাতে মম বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য'

নজরুল কেমন বাঁশি বাজাতেন জানি না। তবে বংশীবাদনরত তাঁর একটি অনবদ্য আলোকচিত্রের সৃষ্টি পর্বের কিছু কথা জানি। নিজে একজন আলোকচিত্রী হিসেবে নজরুল জীবনের নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে সেই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ থেকেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

একটি বিশেষ আলোকচিত্র অর্থাৎ ফটোর কথা বলতে যেয়ে ফটো-সংস্কৃতি বিষয়টি সম্পর্কে উল্লেখ না করে পারছি না। এই সূত্রে বলতে হয় শম্ভু সাহা নামে একজন একনিষ্ঠ আলোকচিত্রী সারা জীবন রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছবি তুলেছিলেন। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে সরকার ছবিগুলি কিনে সত্যজিৎ রায়ের হাতে না দিলে 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রটি তৈরি করা সহজ হতো না। প্রাসঙ্গিক কারণেই কথাগুলোর অবতারণা। বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্র পরিবারে একটা ফটো-সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত ছিল। ঠাকুর পরিবারের কেউ কেউ ছবি তুলতেও পারতেন। অবণীন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী অনেক আলোকচিত্রী রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলেছেন নানাভাবে। সব মিলিয়ে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বিষয়টির রসাস্বাদন করতেন।

যাঁর কথা নিয়ে এই নিবন্ধের সূত্রপাত– সেই কবি নজরুল প্রসঙ্গে বলতে হয়, নজরুল জীবনেও ফটো-সংস্কৃতির একটি ক্ষীণ ধারা লক্ষণীয়। না হলে কবি জীবনের বৈচিত্র্যময় ছবিগুলি পাওয়া যেত না।

আমানুল হক

কর্ণফুলী নদীতে সাম্পানের মাঝি দুই হাতে দাঁড় টানার ভঙ্গিতে হাস্যোজ্জ্বল কবি-সান্নিধ্যে। গলুইয়ের দিকে গানের সুরে মগ্ন কবি। পাড়ে সুবিধাজনক অবস্থানে জায়গা করে নিয়ে বয়োকনিষ্ঠ এক যুবক দশ টাকা দামের বাক্স ক্যামেরার ক্ষুদ্র ভিউ ফাইন্ডারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সাটার টিপছে– এই একটি মাত্র ছবি তোলার বিবরণেই বোঝা যায় দুইপক্ষের আগ্রহ এবং সহযোগিতা ব্যতিরেকে একটি ভাল ছবি হয় না।

ক্যামেরায় যে ফিল্ম ছিল তাতে সর্বমোট আটখানা ছবি তোলা যায়। শৌখিন আলোকচিত্রী এবারে শালবনের সামনে খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে ধ্যান গম্ভীর কবিকে নিপুণ দক্ষতায় ক্যামেরাবন্দী করলেন। এইসব ছবি যে একদিনেই তোলা হয়েছিল তা নয়। এভাবে আরও দু'একটা ছবি তোলার পর আকাশ ও বনানীকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে বাঁশি হাতে কবিকে দাঁড় করানো হলো সুবিধামত জায়গায়। ভক্ত-সুহৃদের তাগিদে যথাসময়ে কবি বাঁশিতে ফুঁ দিলেন নিখাদ সঙ্গীত মগ্নতায়। এভাবেই সৃষ্টি হলো কবি নজরুলের বাঁশি বাজানোর অনবদ্য ছবিটি।

ফটো তোলার নাতিদীর্ঘ এই যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হলো সেই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কে সেই দশ টাকা দামের বাক্স ক্যামেরা হাতে যুবক ফটোগ্রাফার? উত্তরে যে নামটি উচ্চারিত হবে, তিনি আর কেউ নন–পরবর্তীকালে এ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া-সাংবাদিকতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, নজরুল সুহৃদ। কবি নজরুল যাঁকে 'বাহার' বলে সম্বোধন করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসব ছবি তোলার এবং অন্য কার্যকলাপের লীলাভূমি ছিল বাহারদের চট্টগ্রামের বাড়িটিকে কেন্দ্র করে। যেখানে কবির পদার্পণ ঘটেছে একাধিকবার এবং তারই স্মৃতিবহ 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাগুচ্ছের খাতা। 'বাহার ও নাহার'কে–এভাবে উৎসর্গিত। বলা প্রয়োজন 'নাহার' ছিলেন বাহারের সহোদরা, পরবর্তী জীবনে এই বিদুষী মহিলা এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন, তিনি বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন একজন ফটোগ্রাফারের সন্ধান করতে গিয়ে প্রখ্যাত কথাশিল্পী, বন্ধু শামসুদ্দিন আবুল কালামের মাধ্যমে আমাকে খুঁজে বের করেন। বলতে গেলে শৌখিন আলোকচিত্রী হিসাবে ছবি তুলতাম ভালই, তবে জীবিকার সন্ধানে সামান্য বেতনে টাইপিস্টের কাজের সাথে স্টেনোগ্রাফির শিক্ষানবিসতাও করতে হতো। তখন আমি এক পদাতিক।

তেজগাঁও থেকে রমনা, ইডেন বিল্ডিং, নবাবপুর হয়ে সদরঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত সেই বিচরণ ক্ষেত্র। ফটো তোলা ছাড়াও বাড়তি কিছুটা সময়, শ্রম ও অর্থের হিসাব মিলাতে হতো বেহালা নামক অদ্ভুত তারযন্ত্রের আকর্ষণে।

তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত দফতর মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বসাকল্যে ফটোগ্রাফার ছিল মাত্র দু'জন। একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'আজাদ' তখনো প্রকাশ হতো কলকাতা থেকে। ফলে ফটো সাংবাদিকতারও কোন অবকাশ ছিল না। কালক্রমে হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আন্তরিক হৃদ্যতায় পরিণত হয় এবং এই গুণগ্রাহী ব্যক্তির আগ্রহে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'আর্টিস্ট-ফটোগ্রাফার' হিসাবে কাজ পেয়ে যাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৈতৃক সূত্রে ছবি আঁকার হাত ছিল কিছুটা, তা ছাড়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উৎসাহে আর্ট কলেজের খাতায় সাময়িকভাবে নামও লিখিয়েছিলাম।

মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত অবস্থায়ই প্রধানত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ছবি তোলার কারণে তৎকালীন বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়। পরে কলকাতায় চলে যাই। সে অনেক কথা। চল্লিশের দশকে কবি নজরুল অকস্মাৎ রুদ্ধ-বাক। পঞ্চাশের দশকে বাহারও ঘোরতর অসুস্থ। ষাটের দশকের কথা, রোগাগ্রস্ত নজরুল ও বাহার–দু'জনে দু'জনার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকার দৃশ্যটি পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে দেখে কবির বাঁশি বাজানোর ছবি তোলার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। এর পর হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ঢাকায় ফিরে আসার কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে তিনি নজরুলের বাঁশি বাজানোর সেই ছবিসহ কবির অন্য আরও দু'চারখানা ছবির পোকাকাটা নেগেটিভ আমাকে দিয়েছিলেন সম্ভাব্য প্রিন্ট তৈরির জন্য।

স্বাধীনতাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে আমি ঢাকায় ফিরে আসি। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে কবি নজরুলকে নিয়ে আসা হয়। ইতোমধ্যে কবির বাঁশি বাজানোর সেই ছবিখানা বহু চেষ্টায় অনেক বড় করে প্রিন্ট করতে সমর্থ হই। ইচ্ছা ছিল ছবিটি জাদুঘরে হস্তান্তর করার কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিত হয়ে সে ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়। তখন ছবিখানা কিভাবে কাজে লাগানো যায় ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা ধারণা এসে গেল।

কবি নজরুলের বাঁশি বাজানোর ছবিখানার মূল্যায়ন করলে, বলা যায় এটি কবি জীবনের স্বর্ণযুগের স্বাক্ষর বহন করে। ঢাকার 'কবিভবনে' বার্ধক্যপীড়িত নজরুল তখন সম্পূর্ণ সম্বিতবিহীন। তা সত্ত্বেও মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো উঁকি দিত এই ভেবে যে, ছবিখানা কবির সামনে ঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে পারলে হয়ত তাঁর সম্ভাব্য কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে পারে। আর ওভাবেই একটি ভাল ছবির জন্মও হতে পারে।

স্মৃতিভ্রষ্ট হবার পর কলকাতায় এক ভক্তের খাতায় আকস্মিকভাবে 'চিরকবি নজরুল' লিখে দেওয়ায় সবার মনে কিঞ্চিত আশার সঞ্চার হয়েছিল। এ রকম ছোটখাটো কিছু প্রতিক্রিয়া পরবর্তী জীবনেও লক্ষ্য করা গেছে। সেই আশায় বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় একদিন ছবিখানা এবং ফটো তোলার যন্ত্রপাতি নিয়ে উপস্থিত হলাম কবিভবনে। পরিকল্পনা মত বারান্দার দেয়াল বরাবর ছবিখানা রেখে কবিকে নানাভাবে উস্কে দিয়ে তাঁর নিজের সেই বিরাট প্রতিকৃতির কাছে নিয়ে আসতে পারলেও জরা ও বয়সের ভারে ন্যুব্জ কবি নির্বাক আত্মমগ্ন, দুই চোখে অন্তর্লীন বৈরাগ্যের রিক্ত দৃষ্টি অপার শূন্যতায় প্রসারিত। সামান্যতম প্রতিক্রিয়া লাভের সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তখন আমার মনে এই বোধের উদয় হলো যে, সম্পূর্ণ চৈতন্যহীন নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি আসলে নজরুল জীবনের পর্বতপ্রমাণ ট্র্যাজেডিকেই প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো আমার ছবির বিষয়বস্তু।

নজরুল সঙ্গীতের চর্চা-প্রচার ও সংরক্ষণ

রওশন আরা মুস্তাফিজ ॥ নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষণ করার গুরুত্বপূর্ণ কাজের একাংশের সামান্য কিছু দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য সম্প্রতি আমার হয়েছে। তাঁর গানের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড যোগাড় করা, বিভিন্ন জনের নিকট সংগৃহীত দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে অসংখ্য গান সংগ্রহ করা রীতিমতো দুরূহ কাজ। বর্ণানুক্রমে সেইসব গান গ্রথিত করার পর পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য প্রতিটি গানের বাণীর শুদ্ধতা যাচাই এবং প্রুফ দেখার দায়িত্ব দেয়া হয় কয়েকজন নজরুল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞকে। এই গুরুদায়িত্ব পালনকালে গানের প্রারম্ভিক বর্ণ অনুযায়ী এক একটি বর্ণের অন্তর্গত অসংখ্য নতুন গানের সম্ভার দেখে আমার মনে হয়েছে, নজরুলের অগণিত সুন্দর বাণীর গান অনাদরে, অবহেলায় আজ বিস্মৃতপ্রায়। এই গানগুলোর বাণী ও সুরের সঙ্গে আজকের নজরুল সঙ্গীত শিল্পীরা পরিচিত হতে পারলে হয়ত নতুন করে কিছু অপ্রচলিত গান শোনার সুযোগ হবে।

নজরুলের আদি সুর, শুদ্ধ বাণী সংরক্ষণ করার কাজ যেমন কষ্টসাধ্য তেমনই সেইসব গান জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজটি আরও কঠিন বলে মনে হয়। কারণ এ দেশে বর্তমানে শুদ্ধ সঙ্গীত চর্চা বলতে প্রধানত যে গানের চর্চার কথা উল্লেখ করা হয়, তা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা তাঁদের নিজের তাগিদেই করেন। কণ্ঠ তৈরি করতে হলে, নিজেকে একজন পরিপূর্ণ শিল্পীরূপে প্রকাশ করতে হলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। দীর্ঘদিন নিজেকে শিল্পী হিসাবে টিকিয়ে রাখতে দমের অনুশীলন, সুরের প্রয়োগ, তালের প্রথাগত তালিম প্রভৃতি বিষয় রপ্ত করার জন্য অবশ্যই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার প্রয়োজন। বর্তমানে এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত সীমিত। কারণ শুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের প্রচারের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র বলয়ে সীমাবদ্ধ, তদুপরি পৃষ্ঠপোষকতা নেই বললেই চলে। সুতরাং শুদ্ধ সঙ্গীত চর্চাকারীদের মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। এই গান যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা এখন শ্রোতার খোঁজ করেন। গান তো শুধু শিল্পীর নিজের আনন্দের জন্য নয়, শিল্পীর আনন্দের সঙ্গে শ্রোতার ভাল লাগার আনন্দও এক্ষেত্রে কোন অংশে কম নয়।

নজরুল সঙ্গীত চর্চা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গেলে স্বভাবতই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসঙ্গ তুলতে হয় এ কারণে যে, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গীত জীবনের এক বিরাট অধ্যায় ব্যয় করেছেন রাগ সঙ্গীত চর্চা করে। এই উপমহাদেশীয় মার্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিপুল আগ্রহের জন্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদি রূপ, বর্তমান রূপ, ভবিষ্যত পরিকাঠামোর বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন লেখনীর মাধ্যমে। নজরুল ১৯২৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি এবং ১৯৩২ সালে কলকাতা বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর গভীরভাবে সঙ্গীত চর্চায় জড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে ত্রিশের দশকের শেষভাগে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'নবরাগ মালিকা' 'হারামণি' এবং 'গীতি বিচিত্রা' নামক যে সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হতো সেগুলোতে তাঁর সুর করা গানের ছিল আলাদা বৈশিষ্ট্য। এই সময় তিনি সঙ্গীত চর্চায় একেবারে নিমগ্ন চিত্তে নতুন নতুন সুরের ধ্যান করতেন। এক সময় তিনি নতুন রাগরাগিণী সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভব করেন। সঙ্গীত চর্চায় মগ্ন কবির দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং অন্তর্নিহিত শিল্পসত্তা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের নতুন রাগরাগিণী সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগায়। সেই সময় তাঁর সৃষ্ট নতুন, রাগগুলোকে তিনি 'স্বপ্নে পাওয়া' বলে উল্লেখ করতেন।

নজরুল একাধারে গীতিকার এবং সুরকার হওয়াতে তৎকালীন বাংলা গানের জগতে সুরের অসামঞ্জস্য এবং যথাযথ প্রয়োগের অভাব তাঁকে পীড়া দিত। বাংলা গানের এই দৈন্যের কথা উল্লেখ করে কবি তাঁর সৃষ্ট দু'টি রাগরাগিণী প্রসঙ্গে 'দোলন চাঁপা' এবং 'বেণুকার' মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন– "মডার্ন (আধুনিক) গানের সুরের মধ্যে আমি সবচেয়ে যে অভাব অনুভব করি তা হচ্ছে সিমিট্রি (সামঞ্জস্য) বা ইউনিফর্মিটির (সমতা) অভাব। কোন রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সঙ্গীতশাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ সুরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগরাগিণী সৃষ্টির এবং অপ্রচলিত রাগরাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগরাগিণী যদি তার গ্রহ ও ন্যাস এবং বাদী, বিবাদী, সমবাদী মেনে নিয়ে সেই

রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব হবে না।” নজরুল তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির মূল উপাদান হিসাবে এই উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের মূল ভিত্তি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেই সাধনার মাধ্যমরূপে গণ্য করেছেন। তাঁর সঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় ভুবন রচিত হয়েছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর প্রথাগত অনুশীলনের কারণে। কবির স্বল্পস্থায়ী কর্মজীবনের এক বিরাট অংশ তিনি সঙ্গীতের সুধারস সঞ্চয়ে ব্যয় করেছেন। সঙ্গীত ব্যতীত তাঁর কবিসত্তার মূল্যায়ন অসম্ভব। একই সঙ্গে তিনি এই উপমহাদেশীয় লোকজ সঙ্গীতের যে সাধনা করেছেন তার ক্ষেত্র ব্যাপক। নজরুলের সব ধরনের গান গাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে যে কোন শিল্পীকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেই হবে। না হলে সাদামাটা সুরের কিছু সংখ্যক গানের মধ্যেই নজরুল সঙ্গীত সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে চাইলে সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোর যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

বর্তমানে যাঁরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নজরুল সঙ্গীত চর্চা করেন, তাঁদের নিজেকে তুলে ধরার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। সারা বছর বেতার এবং টেলিভিশনে নজরুল সঙ্গীতের যে সব ছকবাঁধা অনুষ্ঠান হয় সেখানে ক'জন সম্ভাবনাময় শিল্পী নিজেকে তুলে ধরতে পারেন? টেলিভিশনে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ত্রিশ-চল্লিশ দশকীয় স্টাইলে সঙ্গীত পরিবেশনার পরিবেশ বর্তমানে এই ইলেক্ট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের যুগে বদলে গেছে। একমাত্র সনাতনী ঢংয়ের গজল, কাওয়ালী ব্যতীত আজকাল অন্যান্য শিল্পী হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। নজরুল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রাগভিত্তিক গানে হারমোনিয়ামের বদলে অনায়াসে তানপুরা, সারেঙ্গী, এস্রাজ ব্যবহার করা যায় এবং অন্যান্য গানে ইলেক্ট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বেহালা, সরোদ, সেতার, বাঁশির সমন্বয়ে অনায়াসে সঙ্গীত পরিবেশন করা যায়।

নজরুল সঙ্গীত প্রচারের ক্ষেত্রে টেলিভিশনে যে অযত্ন চোখে পড়ে তা সত্যি দুঃখজনক। টেলিভিশনে আধুনিক গানের ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর সুরকারের কাছ থেকে কণ্ঠে গান তোলা, যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে মহড়া দিয়ে তা রেকর্ড করা এবং পরবর্তীতে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের দিন পূর্বে ধারণকৃত অডিওর সঙ্গে ঠোঁট মিলানোর পদ্ধতি বহু বছর ধরে চলে আসছে। এতে আধুনিক গানের শিল্পীদের বাড়তি সুবিধা হচ্ছে পূর্বে রেকর্ডকৃত গান গাইবার সময় কোন টেনশন বা ঝুঁকি নেই। এ ছাড়া রেকর্ডকৃত গানের গুণগত মানও ভাল হয়। নজরুল সঙ্গীত শিল্পীদের লাইভ গাইতে হয় বলে কণ্ঠ ও যন্ত্রের সমন্বয় প্রায়শই হয় না। যেনতেন প্রকারে এক একটি গান গেয়ে অনুষ্ঠানের সময় পার করাই থাকে সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

নজরুল সঙ্গীতের প্রতি এই অনাদর, অবহেলার কারণে এখন এই গানের প্রতি শিল্পীদের এক ধরনের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। নজরুল ইনস্টিটিউট বা শিল্পকলা একাডেমীতেও নিয়মিত দর্শক-শ্রোতার সামনে নজরুল সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয় না। নজরুল সঙ্গীত যাঁরা চর্চা করছেন তাঁরা নিজেদের যথাযথরূপে প্রকাশ করার কোন প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে দুঃখজনক হলেও লক্ষণীয়, যে উদ্যম-উৎসাহ নিয়ে একজন শিল্পী নজরুল সঙ্গীত চর্চা করতে আসেন, দীর্ঘদিন চর্চা করার পরও তিনি নিজেকে বেতার, টেলিভিশনে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে তুলে ধরতে পারেন না। অথচ জাতীয় প্রচার মাধ্যম বেতার, টেলিভিশনে নিয়মিত একজন কণ্ঠশিল্পীকে তুলে ধরার মতো কোন অনুষ্ঠান নেই। টেলিভিশনে নতুন শিল্পীরূপে যাঁরা আবির্ভূত হন তাঁরা পরবর্তী আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে এক সময় গানবাজনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গান ছেড়ে দেবার চিন্তাভাবনা শুরু করে দেন। একই সঙ্গে যাঁরা নিয়মিত নজরুল সঙ্গীত চর্চা করে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও বেতার, টেলিভিশনের সুস্পষ্ট অনীহা লক্ষণীয়। বেতার-টেলিভিশনে যেসকল কর্মকর্তা রয়েছেন, সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতি তাঁদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঙ্গীতবিষয়ক জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণেই উদীয়মান শিল্পীদের প্রতি অবজ্ঞা এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের যথাযোগ্য সম্মান না দেয়ার মনমানসিকতা দেখা যায়। দীর্ঘদিন সঙ্গীত সাধনা করে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বেতার ও টেলিভিশনের শ্রোতা-দর্শকরা যাঁদের গান শুনতে চান, তাঁদের সম্বন্ধে এমন মানসিকতার কর্মকর্তাদের বক্তব্য– প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা বহুদিন গান গেয়েছেন, তাঁদের আর গাইবার প্রয়োজন নেই। অথচ আমাদের পাশাপাশি ভারতের শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়– একজন যোগ্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে আরও গান গাইবার সযোগ করে দিতে পারলে কর্মকর্তারা নিজেদের সম্মানিত বোধ করেন।

এ ছাড়াও নজরুলজয়ন্তি পালিত হয় দায়সারাভাবে। ঢাকার বাইরে মফস্বলের শিল্পীদের নিয়ে নিয়মিত নজরুল সঙ্গীত সম্মেলনের উদযোগ পরিলক্ষিত হয় না বললেই চলে। রাজধানীর বাইরে যাঁরা নজরুল সঙ্গীত চর্চা করেন, যাঁরা বছরে অন্তত একবার ঢাকায় এসে সঙ্গীত পরিবেশনের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়। এক সময় হতাশাগ্রস্ত ঐ সব শিল্পী হয়ত সঙ্গীতচর্চাই ছেড়ে দেন।

পরিশেষে বলা যায়– নজরুল সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শুধু গানের বাণী সংরক্ষণ অথবা আদিসুরের ক্যাসেট বাজারে বের করেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যেন শেষ হয়ে না যায়। সারাদেশে যেন নজরুল সঙ্গীত শুদ্ধরূপে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিল্পীদের বিকাশের পথও উন্মুক্ত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় নজরুলের বাণী ও সুর সংরক্ষণের কর্মসূচী এক সময়ে কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।